রেলওয়ে কেনো যথার্থ গণপরিবহন হয়ে ওঠছে না?

মো. আতিকুর রহমান

জমি স্বল্পতা ঘনজনবসতি পরিবেশ এবং সেইসাথে উন্নয়নের তাগিদ বিবেচনায় সড়ক পরিবহণের চাইতে বাংলাদেশে রেলওয়েই বেশি অগ্রাধিকার পাওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ভুল উন্নয়ন নীতি, দুর্নীতি এবং আন্তর্জাতিক ঋণদানকারি সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে নেয়া হয়েছে উল্টো পথ। স্বাধীনতার পর গত ৪৩ বছরে রেলওয়ের সম্প্রসারণের বদলে সংকোচন ঘটানো হয়েছে, সক্ষমতা বাড়ানোর বদলে কমানো হয়েছে। সুলভ, পরিবেশ সম্মত এবং নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। পরপর দুটি প্রবন্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিপর্যয়ের চিত্র এবং তার কারণ তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধে ভারতে রেলওয়ের সক্ষমতা কীভাবে বিকশিত হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদক্ষেপের রূপরেখা স্পষ্ট করা হয়েছে।

আকাশপথে সবচেয়ে দ্রুত গতি কিন্তু খরচ বেশি; জলপথে কম খরচ কিন্তু গতি কম; সড়কপথ নির্মাণ সহজ কিন্তু পরিবহন ঝুঁকি এবং অহরহ দুর্ঘটনা। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে রেলই প্রকৃত অর্থে স্বল্প খরচে নিরাপদ চলাচল ও পরিবহন মাধ্যম। তাইতো রেল জন্মলগ্ন থেকেই জনপ্রিয় একটি বাহন। ভারতবর্ষে যখন প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয়, সে ট্রেনটিতে ছিল তিনটি ফার্স্ট ক্লাস, দুটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা। থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের জন্য ছিল তিনটি ছাদখোলা ওয়াগন এবং গার্ডের জন্য একটি ব্রেক ভ্যান। সেই ট্রেনে চড়ার জন্য ৩০০০ দরখাস্ত জমা পড়েছিল এবং ৯০% যাত্রীকেই হতাশ হতে হয়েছিল।

পরিবেশবান্ধব, আরামদায়ক, নিরাপদ, জ্বালানিসাশ্রয়ী হিসেবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রেলওয়েকে গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত ও পরিবহন মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই পৃথিবীর কোনো দেশেই রেল উপেক্ষিত নয়, বরং রেলের অগ্রগতিতে বেশি মনোনিবেশ করেছে।

রাশিয়া মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত ৯২৮৯ কিলোমিটার ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণ করেছে, যা দুই শ'র বেশি শহর-নগর-বন্দরকে সংযুক্ত করেছে। চীন নির্মাণ করেছে গুয়াংজু থেকে লাসা পর্যন্ত ৪৯৮০ কিলোমিটার রেলপথ। কানাডা টরন্টো থেকে ভ্যাঙ্কুভার পর্যন্ত ৪৪৬৬ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র শিকাগো থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত ৪৩৯০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করেছে। আর আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ডিব্রুগড় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ৪২২৬ কিলোমিটার এবং জম্মু থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ৩৭১৫ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করেছে।

নানা ধরনের ট্রেন দিয়ে বিশ্বের প্রায় সব দেশ ইন্টারসিটি, ইন্টারপ্রভিন্স এবং ইন্টারকান্ট্রি যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলছে। কোনো দেশে আবার বিমানের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে চালু হয়েছে দ্রুতগামী ট্রেন। আর আমরা ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত রেলওয়ে নেটওয়ার্কই চালাতে পারছি না।

পাতালরেল, রোপ ট্রেন, শাটল ট্রেনসহ নানা ধরনের ট্রেন দিয়ে বিশ্বের প্রায় সব দেশ ইন্টারসিটি, ইন্টারপ্রভিন্স এবং ইন্টারকান্ট্রি যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলছে। কোনো দেশে আবার বিমানের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে চালু হয়েছে দ্রুতগামী ট্রেন। আর আমরা ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত রেলওয়ে নেটওয়ার্কই চালাতে পারছি না। ভেঙে পড়েছে আমাদের রেলওয়ে যোগাযোগব্যবস্থা। একের পর এক স্টেশনগুলো বন্ধ, মেয়াদোত্তীর্ণ রোলিং স্টক, জরাজীর্ণ রেল কারখানা, লোকবল সংকট, সময়মতো গন্তব্যে পৌছতে না পারা, টিকিট পেতে ভোগান্তি, ছেঁড়া-নোংরা আসন– এই অবস্থা থেকে বের হতে পারছে না। অনেকটা যেন উল্টো পথে চলছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

বাংলাদেশের রেলওয়ে আজকের যে করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে, তা নিয়তি নয়। এর জন্য দায়ী আমাদের সরকার। অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, সরকারিভাবেই বিমাতাসুলভ আচরণের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বন্দি হয়ে সম্ভাবনাময় রেলওয়ে খাতটি বার বার মুখ থুবড়ে পড়েছে। একসময়ের লাভজনক রেলওয়ে খাত নব্বইয়ের দশক থেকেই লোকসানের ঘানি টানতে থাকে। সময়ের চাহিদানুযায়ী উন্নয়নের উদ্যোগ না নেওয়ায় অব্যাহত লোকসান আর হরিলুটের বোঝা বইতে বইতে গৌরবময় রেল রীতিমতো অভিশাপ হয়ে উঠেছে। অনেক প্রতীক্ষিত স্বতন্ত্র রেল মন্ত্রণালয় হয়েছে, এ সময়ের মধ্যে দেশবাসী শুনেছে কম বয়সী এই মন্ত্রণালয়ের চারজন জাঁদরেল মন্ত্রীর গালভরা সব বুলি। রেলওয়ের যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রী এবং রেল কর্মকর্তাদের কথায় কথায় রেলকে ঢেলে সাজানোর অঙ্গীকার। কাজের কাজ যা হয়েছে তা হলো, মন্ত্রী এবং রেল কর্মকর্তাদের এই ঢালাঢালিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে আজ স্যালাইন- কোরামিন পর্ব শেষে ইনটেনসিভ কেয়ারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

সুষ্ঠু টিকিট ব্যবস্থাপনার অভাব ও দুর্নীতি: তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বিবেচনায় মানুষ রেলপথে ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। কিন্তু যাত্রীদের ভ্রমণের শুরুতেই এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি এবং কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যের কারণে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। শুধু ঈদ-নববর্ষ ইত্যাদি পালা-পার্বণে নয়, টিকিট না পাওয়ার সংকটে প্রতিদিনই ভুগতে হচ্ছে যাত্রীদের। টিকিট কাটতে গিয়ে নির্দিষ্ট বুথ খুঁজে না পাওয়া, নির্বিঘ্নে টিকিট না পাওয়া, দালালদের দৌরাত্ম্য, পকেটমারের হানা, নিরাপত্তা বাহিনীর চাঁদাবাজি ছাড়াও সিটের দখল নিয়ে টানাহেঁচড়াসহ প্রতিদিন নানাভাবে ট্রেনযাত্রীরা ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হচ্ছে।

এছাড়া স্টেশনভিত্তিক ট্রেনের টিকিট বিতরণ এবং কোটাভিত্তিক টিকিটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকা এবং দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসে তার কাঙ্খিত আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা রেলের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ছক ১: বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিসেম্বর মাসে বিক্রীত টিকিট সংক্রান্ত তথ্য

ট্রেনের নাম	প্রাপ্ত রুট কি.মি.	বুকড প্যা. কি.মি.	বিক্রীত টিকিট সংখ্যা
সুবর্ণ এক্সপ্রেস (চট্টগ্রাম)	৭৮৩৩৭৯৩৮	৭৭২৯২৯৪	৯৯%
অগ্নিবীণা (তারাকান্দি)	৪৯২৫৮৩৮	৩১৯০৩২৯	৬৫%
যমুনা এক্সপ্রেস (বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব)	৪০০৭৫৫৬	৩৭৩০৯৭৭	৯৩.১০%
এসারসিন্দুর গোধূলী (কিশোরগঞ্জ)	২৩৮১২৬৫	১৫১০৮৮৮	৬৩.৪৫%
ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস (দেওয়ানগঞ্জ বাজার)	৫৩৬৯৩২৪	৪০২২৭২৮	৭৪.৯২%

সূত্র : বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাণিজ্যিক বিভাগ, ২০১৪

ছক ২: বাংলাদেশ রেলওয়ের জানুয়ারি মাসে বিক্রীত টিকিট সংক্রান্ত তথ্য

ট্রেনের নাম	প্রাপ্ত রুট কি.মি.	বুকড প্যা. কি.মি.	বিক্রীত টিকিট সংখ্যা
সুবর্ণ এক্সপ্রেস (চট্টগ্রাম)	৭৮৩৩৪০	৬৬৩৯০৪৮	৮৫%
অগ্নিবীণা (তারাকান্দি)	৪৯২৫৮৩৮	৩৩২৯৪৬৪	৬৮%
যমুনা এক্সপ্রেস (বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব)	৪০০৭৫৫৬	৩৪১৬৭২৫	৮৫.২৬%
এগারসিন্দুর গোধূলী (কিশোরগঞ্জ)	২৩৮১২৬৫	১৬০০০০৩	৬৭%
ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস (দেওয়ানগঞ্জ বাজার)	৫৩৬৯৩২৪	৩৬৫১৫৯৪	৬৮.০১%

সূত্র : বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাণিজ্যিক বিভাগ, ২০১৫

সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বিলাসবহুল সুবর্ণ এক্সপ্রেস (চট্টগ্রাম) ট্রেনের ৯৯% ও ৮৫% টিকিট বিক্রি করেছে। অথচ এই ট্রেনের টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। যাত্রার দু-এক দিন আগে ট্রেনে টিকিট কাউন্টারে টিকিট পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে যমুনা এক্সপ্রেস এবং ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এসব ট্রেনে দাঁড়িয়ে যাত্রী আসা-যাওয়া করলেও রেল কর্তৃপক্ষ টিকিট বিক্রির হার শতভাগ দেখাতে সক্ষম হচ্ছে না। কাজেই টিকিটের টাকা নিয়ে কী ফাঁকফোকর আছে তা খুঁজে দেখা দরকার।

ট্রেনের সময়সূচি: ২০০৯ সালের পর রেলের উন্নয়নে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার বেশির ভাগই রেললাইন সংস্কার, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও অবকাঠামো তৈরির প্রকল্প। অথচ গত কয়েক বছরে রেলওয়ের সময়ানুবর্তিতার কোনো উন্নয়ন হয়নি। আন্তনগর ট্রেনে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে সময় লাগে সাত-আট ঘণ্টা। অথচ নব্বইয়ের দশকে পাঁচ ঘণ্টায় এ পথে যাতায়াত করা যেত। বর্তমানে বিভিন্ন ট্রেন গড়ে ৭৮% সময়ানুবর্তিতা মেনে চলে। গত বছর এ হার ছিল ৮২%, তার আগের বছর ছিল ৮১%। এমনকি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রেলওয়ের সময়ানুবর্তিতা ছিল ৮৩%। স্টপেজ বাড়ানোর ফলে আন্তনগর ট্রেন এখন অনেকটাই লোকাল ট্রেনে পরিণত হয়েছে। (সূত্র : বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২০১০ ও ২০১৪)

রেলের যাত্রীসেবা: রেলের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী যাত্রীসাধারণের জন্য ট্রেনের অভ্যন্তরে কুশনযুক্ত বসার আসনের কথা বলা হলেও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুশনযুক্ত আসন তো নেই-ই, বরং ছারপোকাযুক্ত ভাঙা সিটই এখন যাত্রীদের যাত্রার সঙ্গী। শুধু তা-ই নয়, সিটের গিয়ার স্প্রিং ও ফোম নষ্ট, হাতল ভাঙা, বাথরুমের দরজার লক ও বাতি নষ্ট। এসি বগিতে এসি নষ্ট, এসির পানি পড়ে সিট ও মেঝে ভিজে দুর্গন্ধ ছড়ায়। প্রথম শ্রেণির বগির যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রাপ্য সেবা থেকে তাঁরা অনেকসময় বঞ্চিত হন (যেমন–সাবান, টাওয়েল, এয়ার ফ্রেশনার)। বেশ কয়েকটি দরজা ও জানালার কাচ ভাঙা, কিছু ক্ষেত্রে লক নষ্ট। মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন প্রত্যাশিত যাত্রী পাচ্ছে না। অথচ ৫০ বছর আগে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ কোটি, তখন প্রতিদিন কলকাতার ট্রেনে যাত্রী মিলত। এখন বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৬ কোটি, অথচ কলকাতার ট্রেনে যাত্রী নেই। কাজেই ভেবে দেখার সময় এসেছে, যাত্রীরা কি স্বেচ্ছায় আকাশ বা সড়কপথে কলকাতা যেতে চায়, নাকি যেতে বাধ্য হয়?

সারা বিশ্ব যখন রেলের যাত্রীসেবা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হয়ে নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, ঠিক সেই সময় আমরা চলছি ঠিক তার উল্টো। সেবা বৃদ্ধি তো দূরে থাক, রেলের লাগাতার লোকসান কমানো এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেলের ভূ-সম্পত্তিসহ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধিতে মনোযোগ না দিয়ে সাধারণ মানুষের পকেটে হাত দেওয়ার মতো অনভিপ্রেত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। তার ফলশ্রুতিতে ২০১২ সালের ১ অক্টোবর যাত্রী ও পণ্য উভয় ক্ষেত্রে ৫০% করে ভাড়া বাড়ানো হয়, যার ফলে দুই বছরের ব্যবধানে রেলের যাত্রী ও পণ্য পরিবহন হ্রাস পায়। অন্যদিকে এই সময়ে রেলের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

ছক ৩: বাংলাদেশ রেলওয়ের বছরভিত্তিক যাত্রী ও মালামাল পরিবহন তথ্য

বছর	যাত্রী পরিবহন (হাজার)	মালামাল পরিবহন (হাজার)
২০০৭-০৮	৫৩৮১৬	৩২৮২
২০০৮-০৯	৬৫০২৯	৩০১০
২০০৯-১০	৬৫৬২৭	২৭১৪
২০১০-১১	৬৩৫৩৬	২৫৫৪
২০১১-১২	৬৬১৩৯	২১৯২
২০১২-১৩ (ভাড়াবৃদ্ধির পর)	৬২৫৯৭	২০১১

সূত্র : বাংলাদেশ রেলওয়ে ইনফরমেশন বুক, ২০১২

সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত যাত্রী পরিবহণের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি থাকলেও ২০১০-১১ অর্থবছরে তা হ্রাস পায়। আবার ২০১১-১২ অর্থবছরে যাত্রী পরিবহন বৃদ্ধি পেলেও পুনরায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে মালামাল পরিবহনের পরিমাণ ছিল ৩৬.৬৬ লক্ষ টন, যা গত ১০ বছরে ৪৫% হ্রাস পেয়ে ২০.১১ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

ছক ৪: বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লোকসান
২০০৯-১০	৫৮৪ কোটি	১৩৪২ কোটি	৭৫৮ কোটি
২০১০-১১	৬১৬ কোটি	১৫৭৪ কোটি	৯৫৮ কোটি
২০১১-১২	৬২৯ কোটি	১৬৭৯ কোটি	১০৫০ কোটি
২০১২-১৩	৮০৪ কোটি	১৬৮৫ কোটি	৮৮১ কোটি
২০১৩-১৪	৯৩১ কোটি	২৭৩৪ কোটি	৮০৩ কোটি

সূত্র : বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার

রেলের ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। তবে ভাড়াবৃদ্ধি রেলের লোকসান এবং আয়বৃদ্ধির একমাত্র পথ নয়। কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ভাড়া বাড়ানোর ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব; যেমন–বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রেলের মাধ্যমে মালামাল পরিবহণ করে। এই সংস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই রেলের চার্জ প্রদান করে না। এক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৩ মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওনা ১২৬১০ কোটি টাকা, যা রেলের কয়েক বছরের বাজেটের সমান। এসব অর্থ আদায় করা সম্ভব হলে রেলে আয় ও সম্পদ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। রেলের জমিতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দোকান নির্মাণ করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে স্টেশন তার আয় বৃদ্ধি করতে পারে। অধিক লোকের কর্মসংস্থান এবং রেলের আয়বৃদ্ধিতে এ ধরনের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পৃক্ত করে রেললাইনের দুই পাশে ফলগাছ রোপণ করা যেতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে এটির বাস্তবায়ন করলে রেলওয়ে এবং স্থানীয় জনগণ উভয়েই আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

রেল কারখানায় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষ লোকবল নিয়োগ করা হয় তাহলে যেসব বগি অচল অবস্থায় পড়ে আছে তা দ্রুত ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভব হবে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে আরো অধিকসংখ্যক যাত্রীসেবা প্রদান করতে পারবে এবং আয়ও বৃদ্ধি পাবে। পোশাক শিল্প খাতের পণ্য এবং বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পণ্য আরো অধিক পরিমাণে রেলে পরিবহন করা সম্ভব হলে রেলের আয় আরো বৃদ্ধি পাবে। রেলের আয়বৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক ইউনিট করা যেতে পারে, যার লক্ষ্য হবে সাধারণ মানুষের রেলসেবা প্রদানের জন্য কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। পাশাপাশি রেলের আয়বৃদ্ধিতে রেলের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, বিজ্ঞাপন, পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন, ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

রেলওয়ের জমি: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সবচেয়ে বেশি ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে রেলের উন্নয়নে তা কোনো কাজে আসছে না।

ছক ৫: বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

জমির বিবরণ	পূর্বাঞ্চল (একর)	পশ্চিমাঞ্চল (একর)	মোট জমির পরিমাণ (একর)
মোট জমি	২৪৪০১.৬২	৩৭২০৪.২২	৬১৬০৫.৮৪
অপারেশন কাজে ব্যবহৃত জমি	১৪৯৯২.০০	১৬৫১৯.৫০	৩১৫১১.৫০
লাইসেন্সকৃত জমি	৪৬৬৮.৪৯	৮০৫২.৯১	১২৭২১.৪০
অবৈধ দখল (সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)	১০৭৮.১৫	৩৩৮৭.২৭	৪৪৬৫.৪২
রেলওয়ের দখলে থাকা অব্যবহৃত জমি	৩৬৬২.৯৮	৯৪৪৪.৫৩	১৩১০৭.৫১

সূত্র : বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভে রিপোর্ট ২০০১

রেলওয়ের জমি নিয়ে দেশজুড়ে চলছে দখল বাণিজ্য, ইজারা জালিয়াতি, ইজারা নিয়ে লাইসেন্স ফি বা মাসুল না দেওয়া, বছরের পর বছর ধরে জমি ফেলে রাখা এবং এক শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে জমি থেকে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আয় করতে পারছে না রেল কর্তৃপক্ষ।

ছক ৬: লিজ/লাইসেন্সের বিপরীতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফির মাধ্যমে অর্জিত আয় (পূর্বাঞ্চল)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	আয় (কোটি টাকা)
২০০৯-১০	১৫.৩০	১২.৩৯
২০১০-১১	১২.৬৫	১৩.৭৫
২০১১-১২	১৫.৭৫	১৭.৯৮
২০১২-১৩	২৩.২০	২৩.৬৮
২০১৩-১৪	২৩.৩৬	২১.৫৮

সূত্র : বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয় সার্ভে রিপোর্ট, ২০১৩

ছক ৭: লিজ/লাইসেন্সের বিপরীতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফির মাধ্যমে অর্জিত আয় (পশ্চিমাঞ্চল)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	আয় (কোটি টাকা)
২০০৯-১০	১০.২০	১০.৩৮
২০১০-১১	১০.৩৫	২২.০৬
২০১১-১২	১৯.২৫	১৩.০৩
২০১২-১৩	১৬.৮০	১৩.৮২
২০১৩-১৪	১৬.৬৫	১৪.৭৭

সূত্র : বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয় সার্ভে রিপোর্ট, ২০১৩

রেল সেকশনের বিভিন্ন স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার কোটি টাকার মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি স্থানীয় প্রভাবশালীরা কৃষি বন্দোবস্ত নিয়ে টিনশেড, পাকা ও আধাপাকা ঘর নির্মাণ করে অন্য লোকজনের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রি ও ভাড়া দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কেউ কেউ রেলওয়ের বন্দোবস্ত নেওয়া জমিজমার সাথে পরিত্যক্ত জমি নিজেদের দখলে নিয়ে চড়া দামে বিক্রি করছে। এই দখলের পেছনে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সুযোগসন্ধানীরা। আবার এমন কিছু অতিচালাক ব্যক্তি রয়েছে এই সমাজে, যারা নিজেদের দখলকে হালাল ও নিরঙ্কুশ করার জন্য দখলকৃত ভূমির একটি অংশে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, জানাজা পড়ার স্থান ইত্যাদি ধর্মসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কারণ তারা ভালো করেই জানে, মসজিদ উচ্ছেদ করার সাহস কেউ পাবে না, কারণ তা করলেই জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে এবং মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। আর এই সুযোগে বাকি অবৈধ সম্পত্তি ভোগ করতে তাদের কোনো অসুবিধাই হবে না।

রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ ও তার অধীনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। এদের দায়িত্ব হচ্ছে জমিজমা, ভবনাদি ও অন্যান্য সম্পত্তির সুরা, সংরক্ষণ, মেরামত, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন প্রভৃতি কাজ পালন করা। নিয়মিত খাজনা পরিশোধ, ভূমি জরিপ ও ভূমি রেকর্ড হালনাগাদকরণ, জমিজমা ও ভবনাদি অবৈধ দখলমুক্তকরণ এবং সেগুলোকে ব্যবহারোপযোগী করে রাখা এদের দায়িত্ব। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অবৈধ দখলে যেমন চলে যাচ্ছে, তেমনি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রেলের প্রায় ১৮৭১ একর জমি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক কনসালট্যান্ট লিমিটেড পরিচালিত সার্ভেতে রেলওয়ের ৫৯৭৩৫ একর জমির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে; বাকি ১৮৭১ একরের কোনো খোঁজ মেলেনি।

ছক ৮: বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে রেকর্ড ও কনসালট্যান্ট অ্যাসেসমেন্টের তথ্য

ভূ-সম্পত্তি (পূর্বাঞ্চল)	বাংলাদেশ রেলওয়ে রেকর্ড (২০০১)	কনসালট্যান্ট অ্যাসেসমেন্ট (২০১৪)
ঢাকা	১৬ হাজার ৭০১ একর	১৫ হাজার ৩৯২ একর
চট্টগ্রাম	৭ হাজার ৭০১ একর	৮ হাজার ১৬৩ একর
মোট	২৪ হাজার ৪০২ একর	২৩ হাজার ৫৫৫ একর

সূত্র : শেলটেক কনসালট্যান্ট লিমিটেড সার্ভে, ২০১৩

ছক ৯: বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে রেকর্ড ও কনসালট্যান্ট অ্যাসেসমেন্টের তথ্য

ভূ-সম্পত্তি (পশ্চিমাঞ্চল)	বাংলাদেশ রেলওয়ে রেকর্ড (২০০১)	কনসালট্যান্ট অ্যাসেসমেন্ট (২০১৪)
পাকশী	২৬৩০৬ একর	২৫৩১৩ একর
লালমনিরহাট	১০৮৯৮ একর	৯৪৬৭ একর
মোট	৩৭২০৪ একর	৩৪৭৮০ একর

সূত্র : শেলটেক কনসালট্যান্ট লিমিটেড সার্ভে, ২০১৩

শুধু তা-ই নয়, নিজের কাছে থাকলে নাকি বেদখল হয়ে যাবে– এই ভয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার ৬০০০ কোটি টাকার ১২৮ একর জমি Elevated Expressway project-এর জন্য দিয়ে দিয়েছে! অথচ কমলাপুর, বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এর জমি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শপিং মল বা বাণিজ্যিক বহুতল ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে। ডাবল লাইনের অংশ বাদ দিয়ে অন্যান্য জমিও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। আর কমলাপুরে আইসিডির অপ্রয়োজনীয় জায়গায় আবাসিক ভবন নির্মাণ করে ভাড়া দিয়েও আয় বাড়ানো যায়। এ ধরনের কোনো পরিকল্পনাই রেলে গ্রহণ করা হচ্ছে না।

পণ্য পরিবহন: রেলপথে পণ্য পরিবহনে নেই চাঁদাবাজির ভয়, দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম। ট্রেনে পণ্য পরিবহনে সবচেয়ে বড় সুবিধাটি হলো সড়কপথের চেয়ে খরচ অনেক কম। এত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দিন দিন রেলের পণ্য পরিবহন কমছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে ট্রেনে পণ্য পরিবহন করা হয় ২৮ লাখ ২২ হাজার টন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যা কমে দাঁড়ায় ২২ লাখ টনে। অথচ ১৯৬৯-৭০ সালে রেলের পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ছিল ৪৮ লাখ ৭৯ হাজার টন।

ছক ১০: বাংলাদেশ রেলওয়ের মালামাল পরিবহন খাতে আয়

অর্থবছর	মালামাল পরিবহন	
	আয় (কোটি টাকা)	প্রবৃদ্ধি
২০০১-০২	১৪৭	
২০০২-০৩	১৪৬	-১%
২০০৩-০৪	১৩৪	-৮%
২০০৪-০৫	১২৬	-৬%
২০০৫-০৬	১০২	-১৯%
২০০৬-০৭	১২৫	২৩%
২০০৭-০৮	১৪১	১৩%
২০০৮-০৯	১৩১	-৭%
২০০৯-১০	১১৭	-১১%
২০১০-১১	১০৫	-১০%
২০১১-১২	৯৬	-৯%
২০১২-১৩	১০৯	১৪%

সূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৪

রেলের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে পণ্য পরিবহন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে কন্টেইনারবাহী একটি ট্রেন থেকে আয় হয় যাত্রীবাহী ট্রেনের প্রায় চার গুণ। ঢাকা-চট্টগ্রামে জনপ্রিয় ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেসে আয় হয় মাত্র দেড় লাখ টাকা। অথচ একটি কন্টেইনারবাহী ট্রেন থেকে রেলওয়ের ছয় লাখ টাকা আয় হয়। পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি না করে বরং স্টেশনগুলোতে কন্টেইনার রাখার জায়গা সংকুচিত করা হচ্ছে। এতে স্টেশনগুলোতে পণ্য ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তেজগাঁও, আখাউড়া ও ময়মনসিংহ স্টেশনে আগে প্রায় ২৬০০ ওয়াগন রাখা যেত, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১৫০০ কন্টেইনার রাখতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, স্টেশনগুলোতে বিপুল পরিমাণ কন্টেইনার অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

জরাজীর্ণ রেল কারখানা: রেলওয়ের লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) তৈরির লক্ষ্য সামনে রেখে পার্বতীপুরে কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় নব্বইয়ের দশকে। অথচ ইঞ্জিন তৈরির চিন্তাভাবনা বা উদ্যোগ আজ পর্যন্ত কেউ গ্রহণ করেনি। বরং এখনো কেনার প্রতিই বেশি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়। এমনকি কারখানাগুলোয় অতি সহজে তৈরি সম্ভব, এমন সব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল না থাকার অজুহাতে 'লোকাল পার্চেজ'-এর নামে চলছে নানা অনিয়ম। আবার দিনের পর দিন কাজহীন পড়ে থাকার কারণে হাজার হাজার কোটি টাকার মেশিন আজ ধ্বংসের মুখে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান দুটি কারখানা সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীতে বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ মেশিনের বয়স ৫০ বছরের ওপরে চলে গেছে। এসব জরাজীর্ণ মেশিন দিয়ে কারখানা তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছে, ঠিক তেমনি শ্রমিকদের প্রতিমুহূর্তেই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় রয়েছে ৭৪০টি মেশিন। এসব মেশিনের বয়স ৮০ থেকে ৯০ বছরের ওপরে। ১৪০ বছরের পুরনো ক্যারেজ শপ, কালার শপ ও ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন মেশিন শপে এসব কোচ মেরামতের কাজ করা হচ্ছে। কোচ পারাপারে ব্যবহার করা হচ্ছে ৮৭ বছরের পুরনো বৈদ্যুতিক ট্রাভারসার।

পাহাড়তলী রেল কারখানায় ৪৩১টি বিভিন্ন ধরনের মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে মেকানিক্যাল বিভাগে ৩৪৪টি ও ইলেকট্রিক বিভাগে ৮৭টি মেশিন। এসব মেশিনের মধ্যে ২০ বছরের নিচে ব্যবহৃত মেশিন ১৭টি। ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ব্যবহৃত মেশিন প্রায় ১০৯টি। ৫০ বছর ধরে ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা ২২৪। কারখানায় কোচ পারাপারে ব্যবহার করা হচ্ছে ৫৬ বছরের পুরনো বৈদ্যুতিক ট্রাভারসার (আলম ও অন্যান্য, ২০১৪)।

ছক ১১:পাহাড়তলী রেল কারখানার প্ল্যান্টস অ্যান্ড মেশিনারিজ সংক্রান্ত তথ্য

	বয়স	মেশিনের সংখ্যা	শতকরা
কারখানার প্ল্যান্টস অ্যান্ড মেশিনারিজ সংখ্যা ৪৩১	৫০ বছরের ঊর্ধ্বে	৪০	৯%
	৪০-৫০ বছরের মধ্যে	২২৪	৫২%
	৩০-৪০ বছরের মধ্যে	৪০	৯%
	২০-৩০ বছরের মধ্যে	১০৯	২৫%

অথচ পর্যাপ্ত বাজেট, প্রয়োজনীয় জনবল, কাঁচামাল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলে সৈয়দপুর ও পার্বতীপুর কারখানায় প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কোচ ও ওয়াগন মেরামতের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করার মতো

কোচ তৈরি করা সম্ভব। ট্রেনের একটি বগি মেরামতে বেসরকারি খাতে খরচ হয় ২৯ লাখ টাকা, যা রেলের নিজস্ব কারখানায় মেরামত করতে লাগে ১৪ লাখ টাকা।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে রেলের পাওনা: বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাছে লিজ বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে, যা রেলের কয়েক বছরের বাজেটের সমান। এসব অর্থ আদায় করা সম্ভব হলে রেলে আয় ও সম্পদ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাছে ১৩ কোটি ৫৬ হাজার টাকা, পাট মন্ত্রণালয় ১০ কোটি ২২ লাখ টাকা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আট কোটি ৫৬ লাখ টাকা, চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী পেপার মিলসের কারখানা এক কোটি ৫৭ লাখ টাকা, চট্টগ্রামের দ্য রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এক কোটি ৪৮ লাখ টাকা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এক কোটি ৪৭ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ৮৮ লাখ টাকা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ৬৫ লাখ টাকা, ঢাকা ওয়াসা ২৯ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ২২ লাখ টাকা, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বর্তমানে বিটিসিএল) ১৯ লাখ টাকা, বেনাপোল স্থলবন্দর ১৬ লাখ টাকা, গ্রামীণফোন ১৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকা, চট্টগ্রামের কদমতলীর ধুম শুভপুর বাস টার্মিনাল এক কোটি ১৫ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম আন্ত:জেলা বাস টার্মিনাল তিন কোটি ১১ লাখ টাকা, টিএম ইন্টারন্যাশনালের (রবি) কাছে পাওনা ৭২ লাখ টাকা। (বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয়, ২০১৩)

উন্নয়ন প্রকল্পের সিংহভাগ অনুৎপাদন খাতে ব্যয়: রেলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কোনো কথা উঠলে প্রথমেই আসে দেশি-বিদেশি কনসালট্যান্ট বা পরামর্শকদের কথা। ২০০৯ থেকে ২০১৩ অর্থবছরে সরকার রেলওয়ের উন্নয়নে ৪০টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পগুলোর ব্যয় ১৯ হাজার ৪৮০ কোটি ৮২ লাখ টাকা ধরা হলেও তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকার ওপর। পাঁচটি প্রকল্প মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর সম্পন্ন হয়েছে। আর ২৭টির মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। শুধু তা-ই নয়, রেলের উন্নয়নে ২০১০ সালে নেওয়া ২২ হাজার কোটি টাকার ৪১টি প্রকল্পের ৮০% অর্থাৎ ১৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান হয় 'দাতা'সংস্থার কাছ থেকে। ওই ঋণের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকাই খরচ হয় পরামর্শক নিয়োগের পেছনে।

ছক ১২: বাংলাদেশ রেলওয়ের গৃহীত প্রকল্প এবং পরামর্শক বাবদ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

সাল	ঋণ প্রদানকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয় (টাকা)	পরামর্শক ব্যয় (টাকা)
২০১০	জাইকা	২৫৪১ কোটি	৯০০ কোটি
২০১১	মাস্ত্র (ইতালি)	১০০০ কোটি	১০০ কোটি
২০১২	এডিবি	১৫৫০ কোটি	৬০০ কোটি
২০১৩	এডিবি, জাইকা, ভারত, চীন	২৫৪০০০ কোটি	৭০০০০ কোটি

সূত্র : দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০১৪

আশির দশকের পর থেকে ঘাটতি ব্যবস্থাপনা এবং কাঠামোগত সংস্কারের নামে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো থেকে কাটছাঁট করার যে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী, দরিদ্র দেশের রেল খাতগুলো সেই একই আত্মবিধ্বংসী সংস্কারের শিকার। আমরা ভুলিনি, বিনিয়োগের অভাবে পাটের মতো একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এদেশে।

সংস্কার প্রকল্পে চাহিদার অতিরিক্ত উপকরণ ক্রয়: আমাদের দেশে প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, 'সরকারি মাল, দরিয়া মে ঢাল।' এটি অবশ্য অনেক পুরনো কথা। আজকালকার লুটেরা গোষ্ঠী দরিয়ায় ঢালার পরিবর্তে সরকারি মাল অর্থাৎ সর্বজনের সম্পদ নিজের পকেটে ঢালতে বা আত্মসাৎ করতেই বেশি আগ্রহী। গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিজের অংশ নিয়ে তারা তৃপ্তি পায় না, তারা চায় সম্ভব হলে পুরোটাই গ্রাস করতে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এই চিত্র লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়েও এর ব্যতিক্রম নয়। পুরনো রেললাইন মেরামত, নতুন রেললাইন নির্মাণ, রোলিং স্টকের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়সহ বিভিন্ন সংস্কার প্রকল্পে বাস্তব অবস্থা ও চাহিদা নিরূপণ না করেই বিভিন্ন উপকরণ কিনেছে রেলওয়ে। এর অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এরকম উপকরণ কিনে রেলের অপচয় হয়েছে প্রায় ১২৬ কোটি টাকা। সম্প্রতি রেল মন্ত্রণালয়ের অডিটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়, যা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অনুমোদনের পর সংসদেও এগুলো উত্থাপন করা হবে।

ছক ১৩: ২০০৯-১০ অর্থবছরে রেলের অতিরিক্ত ব্যয় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য

উপকরণ	অডিট প্রতিবেদন	আর্থিক ক্ষতি (টাকা)
পি-ওয়ে মালামাল ও এমএস রড	অকেজো ফেলে রাখা	১৪.০২ কোটি
অকেজো মালামাল এস-১৩	বিক্রি না করা	২.৮৬ কোটি
৮ সেট পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রসিং	অপ্রয়োজনীয় ক্রয়	৩০.৭৬ লক্ষ
স্লিপার উৎপাদন ও সরবরাহ কাজে মূসক-১১ ২% জরিমানা	চালানে ভ্যাট জমা না করায়	৭৩.১৫ লক্ষ
Table of Organogram & Equipment বহির্ভূত গাড়ি	১৪টি গাড়ি ব্যবহার করায় জ্বালানি খরচ	৫০.৯২ লক্ষ
পি-ওয়ে মালামাল ওপেন লাইনে হস্তান্তর	মালামাল কম সরবরাহ করা	৫.৮৬ কোটি

সূত্র : রেল মন্ত্রণালয়, অডিট বিভাগ রিপোর্ট, ২০১৫

ছক ১৪: ২০১০-১১ অর্থবছরে রেলের অতিরিক্ত ব্যয় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য

উপকরণ	অডিট প্রতিবেদন	আর্থিক ক্ষতি (টাকা)
৫০০ এমজি স্টিল স্লিপার	অপ্রয়োজনীয় ক্রয়	১.৯৪ কোটি
ক্রয়কৃত স্লিপার	অব্যবহৃত	১.৭৪ কোটি
১০২ মে. টন কাটপিস	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফেরত না নেওয়া	৪৫.৯৫ লক্ষ
লোকোমোটিভ যন্ত্রাংশ	অপ্রয়োজনীয় ক্রয়	২.০২ কোটি
পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘন এবং অধিক মূল্যে ১৯টি যন্ত্রাংশ ক্রয়		১.৬৯ কোটি
মেটার ফুয়েল ওয়েল বুস্টার পাম্প	পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘন	২৩.৬১ লক্ষ

সূত্র : রেল মন্ত্রণালয়, অডিট বিভাগ রিপোর্ট, ২০১৫

মেয়াদোত্তীর্ণ রোলিং স্টক: বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ২৮৫টি লোকোমোটিভ আছে। এর মধ্যে ১৮৪টি লোকোমোটিভের ইকোনমিক লাইফ ২০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ১০১টির বয়স ৪০ বছরের অধিক। ফলে লোকোমোটিভের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রেনের সময়সূচি এবং নির্ধারিত গতি প্রায়ই বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া কোচ ও ওয়াগনের সংখ্যাও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। প্রায় ৩৪% কোচ ও ওয়াগনের বয়স ৩৫ বছরের অধিক। একটি লোকোমোটিভ এক ট্রিপে ২০টি কোচ নিয়ে চলাচল করতে সক্ষম হলেও কোচস্বল্পতার কারণে বর্তমানে সর্বোচ্চ ১৩ থেকে ১৫টি কোচ চলাচল করছে। ফলে যাত্রী চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোচের অভাবে যাত্রী পরিবহন করতে পারছে না রেল। (অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১৪)

লোকবল সংকট: এ খাতে লোকবল সংকটের কথা প্রতিদিন শত-সহস্রবার জপে যাচ্ছেন রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিভিন্ন খাতে হাজার হাজার কর্মকর্তা, শিক্ষক, পুলিশ ইত্যাদি নিয়োগ সম্ভব হলেও প্রচুর ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও রেলওয়েতে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না অনেকটা পরিকল্পিতভাবেই। আগস্ট ২০১৩ মাসের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা আছে ৪৯৩ জন। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ৭৩৯ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ১৩ হাজার ১৫ জন, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ১১ হাজার ২২৩ জন কর্মরত। এর মধ্যে এলপিআরে আছে ৩৯৩ জন। বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত ১২৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৪০ হাজার ২৬৪ জন, কর্মরত ২৫৯৮৭ জন। উল্লেখ্য, ১৯৬৯-৭০ সালে রেলে কর্মকর্তা ছিল ২১০ জন এবং কর্মচারী ছিল ৫৫ হাজার ২০৩ জন। ১৯৯১ সালে রেলওয়ে রিকভারি প্রোগ্রামের আওতায় রেলওয়ের লোকবল ৫৮ হাজার জন থেকে ৩৫ হাজার জনে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০০০-০১ সালে কর্মকর্তা বেড়ে হয়েছে ৫০৪ জন, কিন্তু কর্মচারীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ৯৯ জনে। (বাংলাদেশ রেলওয়ে নিউজ লেটার, ২০১৩)

রেলের কারখানাগুলোতে লোকবল ঘাটতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় ৩ হাজার ৫৭৪ জন মঞ্জুরীকৃত পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত ১ হাজার ৬২১ জন (২০১৩ সালের পর্যবেক্ষণ তথ্যানুসারে)। পার্বতীপুর রেল কারখানায় মঞ্জুরীকৃত পদ ৮৪৯ জন, কিন্তু কর্মরত ৫০২ জন। যান্ত্রিক বিভাগ লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই বিভাগের লোকবল দরকার ৫৩২ জন। কর্মরত ৩৩৩ জন। কারখানার জন্য ২০ জন কর্মকর্তার মঞ্জুরি থাকলেও কর্মরত মাত্র ১৩ জন। এছাড়া সহকারী কর্মকর্তার অভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংস্থাপনিক কাজ, ফোর পর্যায়ে লোকোমোটিভ মেরামতের কাজ ও মনিটরিং ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি সহযোগী বিভাগ রয়েছে। এগুলোতে ৪০ শতাংশের বেশি জনবল সংকট চলছে দীর্ঘদিন ধরে। অন্যদিকে ডিজেল লোকোমোটিভ কারখানায়ও একই চিত্র। কারখানায় মঞ্জুরীকৃত পদ আছে ২৯৮টি, এর মধ্যে কর্মরত ১৮৮ জন। পাহাড়তলী রেল কারখানায় ২ হাজার ১২৮ জন কর্মকর্তার বিপরীতে কর্মরত ১ হাজার ২৩৩ জন। অর্থাৎ সৈয়দপুর কারখানায় ৫৫%, পার্বতীপুরে ৪১% এবং পাহাড়তলীতে ৪২% লোকবলের ঘাটতি রয়েছে। এই সংকটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী লোকোমোটিভ, ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানায় লোকোমোটিভ, ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামত করার সুযোগ থাকলেও লোকবল সংকটের কারণে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বাইরে থেকে মেরামত করতে হচ্ছে। (আলম ও অন্যান্য, ২০১৪)

ছক ১৫: রেলওয়ের তিনটি কারখানার লোকবলের চিত্র

কারখানা	বরাদ্দ	কর্মরত	শূন্যপদ	ঘাটতি (%)
সৈয়দপুর	৩৫৭৪	১৬২১	১৯৫৩	৫৫
পার্বতীপুর	৮৪৯	৫০২	৩৪৭	৪১
পাহাড়তলী	২১২৮	১২৩৩	৮৯৫	৪২

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ট্রেন: বাংলাদেশ রেলওয়ে ইতিমধ্যে ১৫টি ট্রেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইজারা ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করছে। এতে রেল বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইজারাদাররা রেলের অর্থ পরিশোধ করেও নিয়মিত মুনাফা করছে। অথচ এই ট্রেনগুলো যখন রেল পরিচালনা করত তখন রেলকে লোকসান গুনতে হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, রেলওয়ের নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা অনেক দুর্বল। এ ধরনের প্রবণতা দূর না হলে রেলওয়ের লোকসানি প্রবণতা দূর করা সম্ভব নয়। যে অর্থে ইজারা দেওয়া হচ্ছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা আয় করছে। এতে রেল কাঙ্খিত আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ছক ১৬: বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের আয় সংক্রান্ত তথ্য

রুট	ইজারা বাবদ আয় (টাকা)	প্রকৃত আয় (টাকা)	বঞ্চিত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	১৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ	৩০ লক্ষ
দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার	৬৪ হাজার	১ লক্ষ	৩৬ হাজার
জামালপুর কমিউটার	৫৩ হাজার	৯০ হাজার	৩৭ হাজার

সূত্র : দৈনিক জনতা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

উপসংহার: এত কিছুর পরও রেল বাংলাদেশের মানুষের কাছে রেলওয়েই সত্যিকারের গণপরিবহন, সাধারণ মানুষের চলাফেরার অবলম্বন। আর তা এতটাই যে কামরায় তিল ধারণের জায়গা না থাকায় ট্রেনের ছাদে ওঠার জন্য মানুষ মই ভাড়া করে। আর ঐতিহ্যবাহী এই পরিবহনটি বিগত দিনগুলোতে বিমাতাসুলভ আচরণ পেয়েও সবাইকে আপন করে বুকেপিঠে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে দেয় তার গন্তব্যে।

মাটির ওপরের রেললাইন ধরে যে রেল চলাচল করে এটি শুধু এক প্রকার যানবাহন নয়, এদেশের মানুষের সংস্কৃতির সাথে মিশে থাকা বাহন। রাস্তায় চলাচলকারী দামি বাস, বহুমূল্যের প্রাইভেট কার কিংবা মিনিবাস দেখে বুঝতে পারি, এগুলোর কোনোটাই আমাদের না। কিন্তু সামান্য ১০ টাকার টিকিট কেটে যখন ট্রেনে চড়ি, তখন অনুভবে বুঝি ট্রেনটি আমাদের। আর সর্বজনের এই বাহনটিকে নিয়ে যারা খেলা করছে, তাদের চিহ্নিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে রেলওয়ে মুক্ত করে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করলে সর্বজনের এই পরিবহন ব্যবস্থাটিতে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার ঘটানো সম্ভব। তাতে সমাজ অর্থনীতিতেও প্রাণ আসবে।

মো. আতিকুর রহমান: একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রেলওয়ে বিষয়ে গবেষণারত

ইমেইল: onatiq88@yahoo.com

তথ্যসূত্র

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১৪

আলম ও অন্যান্য, ২০১৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন এবং রেল কারখানাসমূহ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়ার্কিং টাইম টেবিল নং ৪৬, ২০১০

বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়ার্কিং টাইম টেবিল নং ৫০, ২০১৪

বাংলাদেশ রেলওয়ে ইনফরমেশন বুক, ২০১২

বাংলাদেশ রেলওয়ে বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশ রেলওয়ে সার্ভে রিপোর্ট, ২০০১

বাংলাদেশ রেল মন্ত্রণালয়, সার্ভে রিপোর্ট, ২০১৩

বাংলাদেশ রেলওয়ে নিউজ লেটার, ৫ম বর্ষ, ২০১৩

বিভাগীয় বাণিজ্যিক বিভাগ,বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২০১৫

রেলপথ মন্ত্রণালয়, অডিট বিভাগ রিপোর্ট, ২০১৫

দৈনিক জনতা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০১৪